بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৮ই অক্টোবর, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে অর্জিত বিজয়গাথার নেপথ্য কারণ ও তাঁর শাহাদতের করুণ ইতিহাস তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তাআ'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগের বিজয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তাঁর অন্যতম জীবনীকারক আল্লামা শিবলী নো'মানী সাহেব তাঁর যুগের বিজয়সমূহ ও এগুলোর নেপথ্য কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একজন ঐতিহাসিকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে– মুষ্টিমেয় মরুবাসী কীভাবে সেযুগের পরাশক্তি পারস্য ও রোমের সিংহাসন উল্টে দিল? এটি কি পৃথিবীর গতানুগতিক ইতিহাসের ব্যতিক্রম কোন ঘটনা ছিল? এসব জয়ের নেপথ্যে কী ছিল? এসব বিজয়কে কি আলেকজান্ডার বা চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য জয়ের সাথে তুলনা করা যায়? এসব বিজয়ে খলীফার ভূমিকা কতটুকু ছিল? তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগে **ইসলামী সাম্রাজ্যের আয়তন ২২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০ বর্গমাইল বৃদ্ধি পেয়েছিল**, আর এতে সময় লেগেছিল মাত্র দশ বছরের কিছু বেশি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ইউরোপের ঐতিহাসিকরা বলে, সেসময় পারস্য ও রোমান উভয় সাম্রাজ্যই তাদের উন্নতির শিখরে পৌঁছার পর অবনতির দিকে যাচ্ছিল। পারস্যে খসরু পারভেযের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা একদম ভেঙে পড়েছিল; রাজ্য পরিচালনার মত যোগ্য একক নেতৃত্ব না থাকায় বারবার নেতৃত্বের পালাবদল হচ্ছিল। তাছাড়া তাদের প্রাচীন **যরাথ্রুস্ত্র** ধর্মের বিরুদ্ধে নতুন একটি সামাজিক আন্দোলনও শুরু হয়েছিল যার অনুসারীরা **মুযদাকিয়া** দল নামে পরিচিত। **সম্রাট নোশিরভান** তাদেরকে অস্ত্রবলে দমন করলেও একেবারে নির্মূল করতে পারেনি, আর এরা ইসলামের ধর্মীয় উদারনীতির কারণে মুসলমানদের সমর্থন করেছিল; একইভাবে **খ্রিস্টানদের নেস্টোরিয়ান** গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করতেও মুসলমানরা সক্ষম হয়। রোমান সাম্রাজ্যও তখন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং খ্রিস্টান জনগণের সাথে বিভিন্ন মতভেদের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই ভ্রান্তির অপনোদনে আল্লামা শিবলী নো'মানী সাহেব বলেন, **তাদের বক্তব্য একেবারে বাস্তবতা-বিবর্জিত না হলেও প্রকৃত সত্য নয়**। নিঃসন্দেহে সেই দু'টি সাম্রাজ্য তখন অধঃগতির শিকার ছিল, কিন্তু এর ফলাফল বড়জোর এটি হতে পারতো যে, তারা কোন প্রবল পরাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না; কিন্তু কোনভাবেই আরবের দুর্বল ও অস্ত্রশস্ত্রহীন অগোছালো বাহিনীর সাথে লড়তে গিয়ে তাদের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা নয়! যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, রণকৌশল, প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র ও উপকরণ এবং বিশাল সৈন্যবাহিনী তো পুরোদমেই ছিল। উপরন্তু অন্য কোন দেশের ওপর গিয়ে আক্রমণের বিষয়ও ছিল না, বরং নিজেদের দেশের সুরক্ষা করার বিষয় ছিল। কাজেই, ইউরোপীয়ানদের ব্যাখ্যা আসলে বাস্তবসম্মত নয়। প্রকৃত বিষয় হল, মহানবী (সা.) মুসলমানদের মাঝে যে অদম্য স্পৃহা, দৃঢ় মনোবল, অবিচলতা ও বীরত্বের মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন আর হযরত উমর (রা.) যাকে আরও কয়েকগুণ শক্তিশালী করে তুলেছিলেন—তার সামনে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য তাদের চরম উন্নতির যুগেও দাঁড়াতে পারতো না। হ্যাঁ, এর সাথে

আরও কিছু বিষয় যোগ হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো জয়লাভের ক্ষেত্রে নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। **তার মধ্যে প্রথম হল, মুসলমানদের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা; এর কারণে বিজিত রাজ্যের জনগণ ধর্মীয় মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের শাসনাধীন থাকতে চাইতো।** ইয়ারমূকের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ; মুসলমানগণ কৌশলগত কারণে যখন সিরিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে পিছু হটে, **তখন খ্রিস্টান ও ইহুদীরা কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল যেন মুসলমানরা শাসক হিসেবে পুনরায় তাদের মাঝে ফিরে আসেন**।

হুযূর (আই.) বলেন, সিরিয়া ও মিশরে রোমানদের সাম্রাজ্য ছিল জবরদস্তিমূলক, জনগণ তাদের পক্ষে ছিল না; ফলে যুদ্ধজয়ের পর মুসলমানরা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নি। তবে ইরানের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল; সেখানে সম্রাটের অধীনে বড় বড় নেতৃবৃন্দ ছিল যারা বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশের মালিক ছিল। তারা পারস্য সাম্রাজ্যের জন্য নয় বরং নিজ নিজ রাজ্য রক্ষায় লড়াই করতো, যার কারণে যুদ্ধজয়ের পরও মুসলমানরা অনেক বাধার সম্মুখীন হন। তবে সাধারণ জনগণ কিন্তু তখনও মুসলমানদের পক্ষে ছিল। আবার সিরিয়া ও ইরাকের অনেক বড় বড় নেতা যারা জাতিগতভাবে আরব ছিলেন; তারা প্রথমে প্রতিরোধ করলেও পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান এবং ইসলামের সেবকে পরিণত হন।

আলেকজান্ডার বা চেঙ্গিস খানের তুলনা এখানে মোটেই প্রযোজ্য না, কারণ তারা বড় বড় রাজ্য জয় করলেও তা অত্যাচার, গণহত্যা ও রক্তগঙ্গা বইয়ে করেছিল। সিরিয়ার একটি শহর জয়ের পর আলেকজান্ডার শহরবাসীদের দীর্ঘ প্রতিরোধের শাস্তিস্বরূপ এক হাজার বাসিন্দার শিরোচ্ছেদ করে এবং তাদের ছিন্ন মস্তক শহরের পাঁচিলের ওপর ঝুলিয়ে রাখে এবং ত্রিশ হাজার বাসিন্দাকে দাস বানিয়ে বিক্রি করে দেয়। প্রতিরোধকারী কাউকেই সে প্রাণভিক্ষা দেয় নি। এরকম আরও ঘটনা তার সম্পর্কে জানা যায়। এরকম বিভৎসতার ভয়ে মানুষ এধরনের সম্রাটদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পেতো না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র অধীন মুসলিম বাহিনীর পক্ষে এরূপ কিছু করা অসম্ভব ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কাউকে হত্যা করা তো দূরে থাক— গাছপালা বা ফসলের ক্ষতি করাও নিষিদ্ধ ছিল। বিজিতরা যদি কখনো বিদ্রোহ করেও বসতো, তবুও তাদের ক্ষমাপূর্বক পুনরায় সন্ধির সুযোগ দেয়া হতো। ইতিহাস বলে, **আল্ বাসুস শহরের** বাসিন্দারা যখন পরপর তিনবার বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন তাদের শাস্তি হয়েছিল কেবল নির্বাসন; উপরন্তু নির্বাসনের আগে তাদেরকে তাদের ভূ-সম্পত্তির পূরো মূল্যও দিয়ে দেয়া হয়। সার্বিকভাবে একটি ইসলামী যুদ্ধনীতিও লঙ্ঘন করা হয় নি।

আল্লামা নো'মানী সাহেব বলেন, যারা বলে হযরত উমর (রা.)'র মত বিজেতা ইতিহাসে আরও রয়েছে, তারা পারলে এমন একজনের নাম বলুক, যে এই যাবতীয় নিয়ম-নীতি মেনে এক ইঞ্চি জমিও জয় করেছে! উপরন্তু, চেঙ্গিস খান প্রমুখ বিজেতারা সবসময় নিজেরাই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে, যা বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণ হয়েছে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাঁর পুরো খিলাফতকালে একটি যুদ্ধেও সরাসরি অংশগ্রহণ করেন নি; অবশ্য প্রতিটি যুদ্ধের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই ছিল। তাদের শেষ আপত্তি হল, এসব জয়ে খলীফার কোন কৃতিত্বই নেই, মুসলিম বাহিনী নিজ গতিতে চলেছে ও জয় করেছে— এটিও নিতান্ত ভুল। এসব বিজয়ের ইতিহাস ঘাঁটলেই জানা যায়, পুরো মুসলিম বাহিনী পুতুলের মত খলীফার মুখ পানে চেয়ে থাকতো। এমনকি সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিন্যাস ও গতিবিধি সবই তিনি (রা.) স্বয়ং

ঠিক করে দিতেন ও দিকনির্দেশনা দিয়ে দিতেন। সুদূর মদীনা থেকে এককভাবে তাঁর সুনিপুণ রণকৌশল, দূরদর্শিতা ও দক্ষতার কল্যাণে নিতান্ত অসম্ভব লড়াইয়েও মুসলমানরা জয়ী হয়েছে। মোটকথা, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত এমন একজনও বিজেতা জন্ম নেন নি যিনি হযরত উমর (রা.)'র মত একাধারে মহান বিজেতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন।

হুযূর (আই.) এরপর হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের মর্মান্তিক ইতিহাস সবিস্তারে তুলে ধরেন। তাঁর শাহাদতবরণের জন্য স্বয়ং মহানবী (সা.) দোয়া করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের বরাতে সেই ঘটনা হুযূর উদ্ধৃত করেন। এছাড়া একবার মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-কে সাথে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন এবং তা হঠাৎ কাঁপতে আরম্ভ করে তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন, **'হে উহুদ, শান্ত হও! নিশ্চয়ই তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।'** শাহাদতের জন্য হযরত উমর (রা.)'র হৃদয়ে যে গভীর ব্যাকুলতা ছিল তা তাঁর কন্যা ও মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) দোয়া করতেন— **"হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার পথে শাহাদত দান কর এবং তোমার নবী (সা.)-এর শহর মদীনাতে মৃত্যু দান কর। হযরত হাফসা (রা.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি কীভাবে সম্ভব? তখন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ চাইলে যেকোনভাবে তা করতে পারেন!"** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.), হযরত উমর (রা.)'র এই দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর পরম আত্মনিবেদন ও ভালোবাসার গভীরতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, তাঁর এই দোয়া বাহ্যত অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল; বাহ্যত মদীনাতে তাঁর পক্ষে শহীদ হওয়া কেবল তখনই সম্ভব ছিল— যদি শত্রুপক্ষের কোন বাদশাহ্ একের পর এক মুসলিম রাজ্যগুলোকে পরাজিত করে মদীনায় আক্রমণ করতো ও তাঁকে শহীদ করতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়ের একান্ত অভিপ্রায় জানতেন যে, তিনি মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু— অর্থাৎ নিজ প্রাণ আল্লাহ্কে উপহার দিতে চান। তাই আল্লাহ্ এমন ব্যবস্থা করেন যে, মদীনার ভেতরেই এক কাফির ক্রীতদাসের আক্রমণে তিনি শাহাদতবরণ করেন। অর্থাৎ মানুষ যদি কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র কাছে কোন দোয়া করে, তবে বাহ্যত তা যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন— তা পূরণ করা আল্লাহ্র জন্য অসম্ভব নয়।

হযরত উমর (রা.)'র শাহাদতের বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বিভিন্ন স্বপ্ন সাহাবীরা দেখেছিলেন, যাদের মধ্যে উমর (রা.) নিজেও অন্যতম। তাঁর শাহাদতের দিনক্ষণ নিয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে; গ্রহণযোগ্য বর্ণনা হল, তিনি ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ তারিখে আক্রান্ত হন ও ২৪ হিজরীর পহেলা মহররম তারিখে শাহাদতবরণ করেন ও সমাহিত হন। ফজরের নামাযের সময় **পার্সি ক্রীতদাস আবু লুলু ফিরোযের** আক্রমণে তাঁর আহত হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণসহ হুযূর (আই.) তাঁর শাহাদতের করুণ ইতিহাস তুলে ধরেন। আহত অবস্থায় হযরত উমর (রা.) নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ্কে হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে নিজ প্রাণপ্রিয় দুই সাথী মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)'র সঙ্গে একই কামরায় তাঁকে সমাধিস্থ করার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানোর ঘটনা, তাঁর তিরোধানের পর খিলাফতের নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন ও পরবর্তী খলীফার জন্য বিভিন্ন ওসীয়্যতের বর্ণনা তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) বলেন, এই স্মৃতিচারণের ধারা আগামীতে অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) আজ থেকে আরম্ভ হতে যাওয়া জার্মানির দু'দিনব্যাপী জলসার উল্লেখ করেন ও আগামীকাল শনিবার জলসার সমাপনী ভাষণ প্রদান করবেন বলে ঘোষণা দেন আর সবাইকে এই মহতি জলসার আয়োজন থেকে সমধিক লাভবান হওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়া হুযূর সম্প্রতি প্রয়াত দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোরও ঘোষণা দেন; তারা হলেন যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ মোকাররম মওলানা কমরুদ্দীন সাহেব ও মরহুম সুলতান হারুন খান সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা সাবিহা হারুন সাহেবা। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে তাদের অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলী, ধর্মসেবা, পবিত্র আদর্শ, ধার্মিকতা, দানশীলতা, স্বল্পে-তুষ্টি ও খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। হুযূর (আই.) তাদের রূহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন এবং তাদের বংশধরদের মাঝে তাদের পুণ্য আদর্শ বহমান থাকার জন্য দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]